তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: প্রয়োগ বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ড. জিল্লুর রহমান পল*

Abstract

Information is power. It is one of the tools of ensuring corruption free society. Free flow of information ensures transparency and accountability. It is guaranteed by the constitution of the People's Republic of Bangladesh. Therefore, it is the government obligation to ensure good governance in all offices. Realizing it, the government enacted an effective and pro-people law titled 'Right to Information, 2009' (RTI) through which government, semi-government and autonomous bodies are bound to provide information to the seeker. The article has attempted to analyze critically the current implementation reality of the act, its challenges and remedies. Analyzing the reatlity, it can be said that the implementation of this act could not reach to expected level because of having small amount of application compare to huge population of the country. Some of the challenges viz. poor knowledge on RTI, culture of secrecy, poor management of information etc. are identified here. To overcome these challenges, increasing of mass awareness on RTI, publicity, ensuring the digital information management system, maximum self-disclosure of information and adequate quality training on RTI to designated officer and appeal authority etc. could be done.

১. ভূমিকা

বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তির যুগ। মানুষের পাশে শুধু তথ্যের প্লাবন। অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স হিসেবে তথ্য হলো তা, যা মানুষের অনিশ্চয়তা দূর করে। তথ্য প্রাণ – আধুনিক রাষ্ট্রের; তথ্য অক্সিজেন – গণতন্ত্রের; তথ্যহীন থাকা মানে সন্দেহে থাকা; অনিশ্চয়তায় বসবাস (দাশ ও ফেরদৌস, ২০০৭)। তথ্যের মহাসড়ক ধরে মানুষের প্রতিদিনের পথচলা। যার কাছে যত বেশি তথ্য আছে সে তত শক্তিশালী (রহমান, ২০১০)। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. আ

* সহকারী অধ্যাপক, ফিল্ম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

আ স স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'তথ্য এক ধরনের সম্পদ। জনগণের মধ্যে এটা যত ছড়ানো যাবে, জনগণ তত সমৃদ্ধ হবে। তথ্যের পরিপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতি কল্পনা করা যায় না। প্রতিটি উন্নত দেশের দিকে তাকালেই এ সত্যই উপলব্ধি করতে পারবো' (ফেরদৌস ও রহমান, ২০০৮)। দেশের গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের এমন উপলব্ধি দীর্ঘকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশন সুপারিশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় (তথ্য কমিশন, ২০১০)। দেশের আইন-বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিতি সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-সরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা তথা সকল ধরনের দপ্তরের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সংবিধানের অন্যতম মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে (আহমদ, ২০১৯: ৩)। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কর্তৃপক্ষের যে তথ্যগুলো কাজে লাগে আর তা যদি না পাওয়া যায়, তবে এই আইনের অধীনে সেসব তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করা যায় এবং তা প্রাপ্তি ঘটে থাকে।

তথ্য চাওয়ার, পাওয়ার ও প্রকাশের বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির নাগরিক অধিকার। জানার অধিকার মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। তথ্য জানানো তো আর নিছক তথ্য জানানোর জন্য নয় বরং তথ্যের রয়েছে বিরাট এক সামাজিক উপযোগিতা। এর বিজড়ন তাই বিচিত্র ও বহুবিধ। ক্রেতা হিসেবে যেমন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে খাবারের প্যাকেটে খাদ্য উপকরণ, খাদ্যগুণ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানা; কৃষকের অধিকার রয়েছে নতুন বীজ, সার আর সেচ পদ্ধতির খবর জানার। কাজেই তথ্য জানার গুরুত্ব রাষ্ট্র জীবন, সমাজ জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনেও পরিব্যাপ্ত (ফেরদৌস ও রহমান, ২০০৮)। অর্থাৎ, মানুষ নানা কারণে তথ্য চায়। তাঁর প্রয়োজনেই বিভিন্ন তথ্যের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে জীবনব্যাপী। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই জীবনের নানা সমস্যা-সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি-প্রত্যাশা গভীরভাবে অনুভূত হয়। অন্য কথায়, নাগরিক জীবনকে ঘিরে যত সব আয়োজন, যত কিছুর প্রয়োজন, সবই তথ্যের কারণেই অর্থবহ হয়ে উঠে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এ তথ্যের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে,

> "'তথ্য' অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে

কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না" (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯)।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে বর্ণিত সংজ্ঞা মতে তথ্য প্রদান করা দেশের সকল সরকারি- বেসরকারি দপ্তর তথা কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। আইনটি ২০০৯ সালের ০১ জুলাই কার্যকর হওয়ার পর প্রায় এক যুগ অতিবাহিত হতে চলছে। কিন্তু এ আইনের প্রয়োগ বাস্তবতা কেমন বা বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদানও সমভাবে জরুরি। আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে এ বিষয়গুলোকে অ্যাকাডেমিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস (যেমন- বই, জার্নাল, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেন, ওয়েবপেজ, সংবাদপত্র, প্রতিবেদন, মতামত ইত্যাদি) থেকে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। গবেষকের পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে নিবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কী

২.১ সংবিধানের চেতনা ও তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের মূল চেতনার সাথে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সংবিধানের ৭(১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-৭)। জনগণ মালিক হলে তার সেবায় নিয়োজিত কর্মচারীগণের জবাবদিহিতা থাকা আবশ্যক যা তথ্য অধিকার আইনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-১১)। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অবাধ তথ্য প্রবাহ একটি পূর্বশর্তস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, রাষ্ট্রের তথ্যের প্রবাহ অবাধ হলে, গণতন্ত্রের পূর্বশত যা, ঠেকানো যায় এমনকি দুর্ভিক্ষও (তথ্য কমিশন, ২০০৯)। অবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারও নিশ্চিত হয়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করার অনেকটা গ্যারেন্টি দেয়া হয়েছে। এ আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ একজন নাগরিককে

তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে' (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯)। এ ছাড়া সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের ভাবনা-চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বা গণমাধ্যমে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ না থাকার বিষয়টি সংবিধান স্বীকৃত। তথ্য অধিকার আইন মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার বাধাকে দূর করে তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এ আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো-

ক) নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণ;

খ) সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো;

গ) দুর্নীতি হ্রাসকরণ;

ঘ) সুশাসন নিশ্চিতকরণ;

ঙ) প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং

চ) অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রস্তাবনায় আইনের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে সংবিধানের চেতনার সাথে বর্ণিত বিষয়গুলোর আলোকপাত করা হয়েছে।

২.২ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সার-সংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইনটি ২০০৯ সালের ২০ নং আইন যা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাস হয় ২৯ মার্চ ২০০৯ এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ০৫ এপ্রিল ২০০৯। গেজেট আকারে প্রকাশ হয় ০৬ এপ্রিল ২০০৯ এবং কার্যকর হয় একই বছরের ০১ জুলাই থেকে। তথ্য কমিশন গঠন হয় ০১ জুলাই ২০০৯। এ আইনে ০৮টি অধ্যায় এবং ৩৭টি ধারা রয়েছে। সংক্ষেপে অধ্যায়গুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ:

- প্রথম অধ্যায়- প্রারম্ভিক: এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন, বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও আইনের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

- দ্বিতীয় অধ্যায়- তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি: এই অধ্যায়ে তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রকাশ, কোন কোন তথ্য প্রকাশ বা প্রদান

বাধ্যতামূলক নয়, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, তথ্য প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি বর্ণিত আছে।

- তৃতীয় অধ্যায়- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: এ অধ্যায়ে প্রত্যেক অফিসে তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োজন ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

- চতুর্থ অধ্যায়- তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি: এ অধ্যায়ে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, তথ্য কমিশন গঠন, তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ ইত্যাদি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ, তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি, তথ্য কমিশনের সভা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত রয়েছে।

- পঞ্চম অধ্যায়- তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি: এ অধ্যায়ে তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি, বাজেট, তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা, হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে।

- ষষ্ঠ অধ্যায়- তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী: এ অধ্যায়ে তথ্য কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

- সপ্তম অধ্যায়- আপিল, অভিযোগ ইত্যাদি: এ অধ্যায়ে আপিল নিষ্পত্তি, অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, প্রতিনিধিত্ব, জরিমানা, Limitation Act ১৯০৮, মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

- অষ্টম অধ্যায়- বিবিধ: সর্বশেষ অধ্যায়টিতে তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ, কতিপয় সংস্থা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের প্রয়োগ অব্যাহতি, বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা, অস্পষ্টতা দূরীকরণ, মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ, রহিতকরণ ও হেফাজত ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

- এ ছাড়া তথ্য অধিকার আইন (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা ২০১১ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০ জারি করা হয়েছে।

২.৩ কীভাবে তথ্য সেবা পাওয়া যায়

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারি- বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত রয়েছে যিনি জনগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমগুলো অনুসরণপূর্বক কাঙ্খিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণ করে সরবরাহ করবেন। সাধারণত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ বা ক্ষেত্রমতে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল এবং সে ক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারি ও শুনানি গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তরকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করতে হয় এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানি আদালতের মতো তথ্য কমিশন কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোনো কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের তথা দপ্তরের নিকট সুপারিশ করতে পারে এবং উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারে (রফিকুজ্জামান, ২০১৬)।

৩. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রয়োগ বাস্তবতা বিশ্লেষণ

প্রকৃতপক্ষে তথ্যের অধিকার ছাড়া সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অকল্পনীয়। তথ্য অধিকার, তথ্যের আদান-প্রদান এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকার আইনের মূল দর্শন মূলত এগুলোই। এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। সব উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেষ্টনির তথ্য জনগণকে জানাতে হবে, জনগণের এসব অধিকারের তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক। তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিপূর্ণ, অরক্ষিত ও প্রান্তিক জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় নিশ্চিত করে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাই তথ্য অধিকারকে বলা হয় 'Right of all rights'। এটি সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদের পূর্বশর্ত। তথ্য অধিকার আইনটি সর্বজনীন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে, জনগণকে সব কাজে অংশগ্রহণের

অধিকার দেয়, উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসে। এটি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের মূল চেতনারই প্রতিফলন (আহমদ, ২০১৮)।

তথ্যই শক্তি আর তথ্যে প্রবেশাধিকার ক্ষমতায়ন মানে জনগণের ক্ষমতায়ন। অন্যদিকে সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদ মতে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)। বিশ্বব্যাপী কর্তৃপক্ষের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে – বলা যায় 'paradigm shift' হয়েছে। নাগরিকের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দ্রুত ও নির্ঝঞ্ঝাট সেবা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি কর্তৃপক্ষকে তাই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA- Annual Performane Agreement), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS- National Integrity Strategy), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS- Grievance Redress System), ওয়ান স্টপ সেবা (One Stop Service), উদ্ভাবন (Innovation), ডিজিটাল বাংলাদেশ এর চর্চা করতে হচ্ছে। এ সব কাজে সফলতার পূর্বশর্ত হলো অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ (প্রাগুক্ত)। তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রচলিত অন্য কোন আইনের – (ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুন্ন হইবে না; এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে'। এ ছাড়া ৬(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না' (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯)। অর্থাৎ, জনগণের ক্ষমতায়নে আইনটি তাৎপর্যরূপে প্রণীত হয়েছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' এর মূলনীতি No one will be left behind বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সমাজের সব ক্ষেত্রে অসমতা নিরসনের মূলে কাজ করতে পারে তথ্য ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার। সব ধরনের দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই কৃষি, সকলের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, অসমতার নিরসন, পরিমিত ভোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, জবাবদিহিতাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ এবং অংশীদারত্ব ইত্যাদি হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৬.১০ লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে, 'জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান'

(সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ২০১৭)। তথ্য অধিকার আইনটি বর্ণিত অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার পরিপূরক। শুধু এটি নয়; মুক্ত সমাজ ও জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, ভোটাধিকার, অসমতা-বৈষম্য-বঞ্চনার অবসান, নারীর ক্ষমতায়ন, শ্রেণি বৈষম্য নিরসন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের মূল বিবেচ্য বিষয় হলো তথ্যে প্রবেশাধিকার। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রয়োগ এসব অর্জনের সঠিক পথ-নির্দেশনা দিতে পারে।

কিন্তু গত প্রায় এক যুগে আইনটির সঠিক পথ-নির্দেশনা প্রদানের বাস্তবতা কেমন তা নিয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তথ্য কমিশনের বিগত ০৩ বছরের (২০১৬-২০১৮) প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের আলোকে বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

৩.১ তথ্যের জন্য দাখিলকৃত আবেদন

তথ্য কমিশনে বিগত ০৩ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সারা দেশে বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চেয়ে মোট আবেদন পড়েছে ২৩ হাজার ১৯৬টি যার প্রায় ৯৪% ভাগ আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন প্রায় ৯৬% যা সংখ্যায় ২২ হাজার ২১৫টি আর এনজিও/ বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট মাত্র প্রায় ৪% তথা ৯ শত ৮১টি। নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিপুল তথ্য চাহিদার বিপরীতে আবেদনের সংখ্যা খুবই বেশি নয়। প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশে এত কম সংখ্যক তথ্য চেয়ে আবেদন আশাব্যঞ্জক নয়। ঠিক এ ধরনের একটি চিত্র ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর একটি প্রতিবেদনে উঠে আসে। টিআইবি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১০ বছরে তথ্য অধিকার পাওয়ার জন্য ৯৯ হাজার ২৩৮টি আবেদন জমা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় খুবই সামান্য। গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিংয়ে ১২৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ২৬তম অবস্থানে রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় (জাগোনিউজ২৪.কম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। তবে আশার চিত্র হলো গত তিন বছরে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রায় ৯৪% ভাগ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। যেসব তথ্য দেয়া হয়নি তার মধ্যে প্রক্রিয়াধীন আবেদন রয়েছে। বিষয়টি সরকারি- বেসরকারি কর্তৃপক্ষের মানসিকতার পরিবর্তনে একটি ইঙ্গিত বহন করে।

সারণি-৩.১.১: তথ্যের জন্য দাখিলকৃত আবেদন সংখ্যা ও তথ্য প্রদানের হার

সময়	মোট আবেদন সংখ্যা	কর্তৃপক্ষওয়ারি আবেদন সংখ্যা		তথ্য প্রদানের সংখ্যা ও হার
		সরকারি	এনজিও/ বেসরকারি	
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	৬,৩৬৯	৬,১৭২ (৯৬.৯১%)	১৯৭ (৩.০৯%)	৬,০৮২ (৯৬.৫০%)
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৮,১৬৭	৭,৭৬৮ (৯৫.১১%)	৩৯৯ (৪.৮৯%)	৭,৮০৮ (৯৫.৬০%)
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮	৮,৬৬০	৮,২৮৫ (৯৬.৫৬%)	৩৮৫ (৪.৪৪%)	৮,০০৮ (৯২.৪৭%)
সর্বমোট	২৩,১৯৬	২২,২১৫ (৯৫.৭৭%)	৯৮১ (৪.২৩%)	২১,৮৯৮ (৯৪.৪০%)

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮। বন্ধনীতে শতকরা হার নির্দেশিত)

৩.২ তথ্য না পেয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল

নিচের সারণি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বিগত ২০১৬-১৮ মেয়াদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য না পেয়ে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান বা আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিলের মোট সংখ্যা ৭ শত ৮৯টি। যার মধ্যে ৯২% ভাগই আপিল কর্তৃপক্ষ নিষ্পত্তি করেছে আর মাত্র ৮% ভাগ আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষকে আপিল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করতে হয়। তবে প্রতি বছর আপিলে সংখ্যা বৃদ্ধি নেতিবাচক তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ এতে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পেশাদারিত্বের ঘাটতি সহ অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। কারণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রত্যাখ্যাত বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলেই আপিলের বিষয়টি আসে।

সারণি-৩.২.১: তথ্য কমিশনে আপিল সংক্রান্ত তথ্যাদি

সময়	আপিলে সংখ্যা	আপিল নিষ্পত্তির সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন আপিলের সংখ্যা
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	২০১	১৮৩	১৮
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	২৩৩	২১৫	১৮
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮	৩৫৫	৩২৭	২৮
সর্বমোট	৭৮৯	৭২৫ (৯২%)	৬৪ (৮%)

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮)

৩.৩ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য না পেলে নাগরিকগণ আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল আবেদন করতে পারেন। আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতেও তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায়। তথ্য অধিকার আইনের ১৩ এবং ২৫ ধারার আওতায় কমিশন অভিযোগসমূহ আমলে নেয়া, শুনানি গ্রহণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও নিষ্পত্তি করে থাকে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত কমিশনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মোট ২ হাজার ৯৪৪টি অভিযোগ দায়ের করেছে। ২০১৭ সাল ব্যতীত অন্যান্য বছরে অভিযোগ দায়েরের হার ঊর্ধ্বমুখী। বিষয়টি ইতিবাচক নয়। কারণ, আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য না পেলেই তবে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায়। এতে জনগণের ভোগান্তি বাড়ে। অর্থাৎ, এখানে আপিল কর্তৃপক্ষের পেশাদারিত্বের ঘাটতি সহ অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। আবার ২০১৮ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক শুনানির জন্য গৃহীত হয়েছে প্রায় ৬৩% ভাগ অভিযোগ (তথ্য কমিশন, ২০১৮)। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আপিল করার বিধি বা পুরো আইন সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নন। তাই বিপুল সংখ্যক অভিযোগ শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি।

সারণি-৩.৩.১: তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	মোট অভিযোগ	শুনানির জন্য গৃহীত	শুনানির জন্য গ্রহণের হার
২০০৯-২০১৪	৮০৭	৪২৪	৫২.৫৪%
২০১৫	৩৩৬	২৪০	৭১.৪৩%
২০১৬	৫৩৯	৩৬৪	৬৭.৫৩%
২০১৭	৫৩০	৪০৩	৭৬.০৪%
২০১৮	৭৩২	৪৩৮	৫৯.৮৪%
সর্বমোট (২০০৯-২০১৮)	২,৯৪৪	১,৮৬৯	৬৩.৪৯%

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৮: ৯৩)

৩.৪ জনগণ কর্তৃক যাচিত তথ্যের প্রকৃতি

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় কী ধরনের তথ্য কর্তৃপক্ষ প্রদান করতে বাধ্য তা বর্ণিত রয়েছে। কমিশনের প্রথম দিকে বিশেষ করে ২০১০ এবং ২০১১ সালে প্রণীত প্রতিবেদনে মাঠ পর্যায়ে কী ধরনের তথ্য জনগণ চেয়েছে তার প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে এটি দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত চিত্র পাওয়া খুবই দুষ্কর যা অবাধ তথ্যের প্রবাহ পথে একটি বাধা। কারণ, তথ্য অধিকার আইনের মূল চেতনা হলো দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন। যাচিত তথ্যের প্রকৃতি জানতে পারলে আইনটির সঠিক চর্চা হচ্ছে কীনা সে সম্পর্কে সহজেই জানা সম্ভব হয়। তাই প্রতিবেদনে যাচিত তথ্যের প্রকৃতি থাকা উচিত বলে মনে হয়। তবে তথ্য কমিশনে যেসব তথ্য না পেয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় তা থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। কমিশনের ২০১৮ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ রয়েছে। আবার ২০১৬ এবং ২০১৭ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বিষয়টি উল্লেখ নেই। কমিশনের ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২০ ধরনের তথ্য না পেয়ে জনগণ কর্তৃক দায়েরকৃত ৪৩৮টি অভিযোগ শুনানির জন্য গৃহীত হয়েছে (তথ্য কমিশন, ২০১৮: ১০১-১০৪)।

বেসরকারি সংস্থা রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (RIB) বিগত ২০০৯-২০১০ সালের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। সেখানে বলা হয় জনগণ যেসব তথ্যের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে তার বেশির ভাগই তথ্য অধিকার আইনের মৌল যে উদ্দেশ্য – সরকার ও এনজিওদের কাজে স্বচ্ছতা

ও জবাবদিহিতা তৈরি করা, দুর্নীতি হ্রাস করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা- তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় (রিইব, ২০১১)। যেমন বিপুল সংখ্যক আবেদন পড়েছে কীভাবে বন্দুকের লাইসেন্স পাওয়া যায়, কীভাবে ব্যাংকে একাউন্ট খোল যায়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরে কী ধরনের সেবা পাওয়া যায় ইত্যাদি। এসব কোনো গোপন তথ্য নয় বা এর সঙ্গে দুর্নীতি বা জবাবদিহিতার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। এ তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারেরও প্রয়োজন পড়ে না (ফেরদৌস, ২০১১)। কিন্তু সম্প্রতি এ অবস্থার কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, ১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত তথ্য কমিশন যেসব অভিযোগ শুনানি করেছে তার মধ্যে ভূমি, বিসিএস পরীক্ষা, দরপত্র, কমিশনের সিদ্ধান্তকে আমলে না নেয়া, প্রকল্প, ব্যাংক ঋণ, বরাদ্দ, প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এতে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটের কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হতে শুরু হয়েছে। তবে তা কোনোভাবেই সন্তোষজনক বলা যাবে না।

সারণি-৩.৪.১: তথ্য কমিশনে শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের যাচিত তথ্যের প্রকৃতি

যাচিত তথ্যের ধরন	অভিযোগের সংখ্যা*
ভূমি সংক্রান্ত	৩৯
বিসিএস পরীক্ষা সংক্রান্ত	৩০
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক তথ্য	২৯
তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেয়া সংক্রান্ত	২৬
চাকুরি নিয়োগ সংক্রান্ত	২২
তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আংশিক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত	২০
ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত	১৪
নির্মাণ সংক্রান্ত	১২
প্রকল্প সংক্রান্ত	১২
এলজিএসপি বরাদ্দ/ব্যয় সংক্রান্ত	১২
নিয়োগ সংক্রান্ত	১১
মামলা সংক্রান্ত	১১
দরপত্র সংক্রান্ত	১০
বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত	০৮

প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত	০৭
জরিপ/সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত	০৪
থানায় অভিযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	০৪
মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও তালিকা সংক্রান্ত	০৪

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৮: ১০১-১০৪। * ন্যূনতম ০৪টি অভিযোগের সংখ্যা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।)

৩.৫ এনজিওতে তথ্যের জন্য আবেদন

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে এদেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও এর ভূমিকা রয়েছে। নাগরিক সমাজের সাথে এনজিও কাজ করেছে জনমত তৈরিতে বা চাপ সৃষ্টিতে। তবে এনজিওদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে সব সময়ই সাধারণ মানুষের মাঝে কৌতুহল রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার বা বিদেশ থেকে অর্থ এনে কীভাবে ব্যয় করা হয় বা পরিচালনা ব্যয় কত ইত্যাদি সম্পর্কে অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে সব সময়ই আলোচনা ছিল। এ সম্পর্কে এক সময় সঠিক তথ্য পাওয়া যেত না। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিগত ৩ বছরে (২০১৬-২০১৮) এসব এনজিওতে তথ্য চেয়ে মোট ৯ শত ২৮টি আবেদন করা হয়েছে যার মধ্যে ৮ শত ৮৬টি আবেদনের তথ্য দেয়া হয়েছে যা ৯৫% ভাগ। বিশেষ করে ২০১৭ সালে যাচিত তথ্যের সবই দেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। প্রতি বছর এ সংখ্যা বাড়ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৬ সালে মাত্র ১৪টি, ২০১৭ সালে ১৩টি এবং ২০১৮ সালে ০৪টি এনজিওতে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন পেয়ে তথ্য প্রদান করেছে টিআইবি। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর তথ্য মতে, জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এদেশে ২ হাজার ৫০১টি এনজিও কাজ করছে (www.ngoab.gov.bd)। এর তুলনায় তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা প্রত্যাশাব্যঞ্জক নয়। এ প্রসঙ্গে গবেষক মুহাম্মদ লুৎফুল হক মনে করেন, 'আইন প্রণয়নের পর এনজিও ও সুশীল সমাজকে খুব একটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না, যদিও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে এদেরই ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। রাজধানী ও বড় শহরকেন্দ্রিক কয়েকটি এনজিও তথ্য অধিকার নিয়ে কিছু তৎপরতা দেখালেও সার্বিক বিবেচনায় তা অতি নগণ্য। এনজিওদের নিস্পৃহ হওয়ার প্রধান কারণ তথ্য অধিকার আইন তাদের জন্যও প্রযোজ্য, যা তাদের কাছে কাম্য ছিল না' (হক, ২০১৩)।

সারণি-৩.৫.১: এনজিও তে তথ্যের জন্য আবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি

সময়	তথ্যের জন্য আবেদন সংখ্যা	তথ্য প্রদানের সংখ্যা	তথ্য না দেয়ার সংখ্যা
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	১৯৭	১৯২	০৫
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৩৪৬	৩৪৬	-
০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮	৩৮৫	৩৪৮	৩৭
সর্বমোট	৯২৮	৮৮৬ (৯৫%)	৪২ (৫%)

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮)

৩.৬ *সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ০৫টি মন্ত্রণালয়*

তথ্য চেয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আবেদনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিগত ০৩ বছরে (২০১৬-১৮) সরকারের ০৯টি মন্ত্রণালয় ঘুরে ফিরে সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্তির ০৫টি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলো হলো কৃষি, অর্থ, এলজিআরডি এন্ড সি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক, জনপ্রশাসন, পরিকল্পনা, শিক্ষা, শিল্প এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, এদের মধ্যে কৃষি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি এন্ড সি) মন্ত্রণালয় প্রতিবছর সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ০৫টির মধ্যে রয়েছে। তবে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকেই সবচেয়ে বেশি তথ্য চাওয়া হয়েছে এবং এ মন্ত্রণালয় ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে আবেদনপ্রাপ্তির শীর্ষস্থানে ছিল। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে জনপ্রশাসন এবং এলজিআরডি এন্ড সি মন্ত্রণালয়। কৃষি যে অর্থনীতির মূল প্রাণ বা কৃষি কেন্দ্রীক আমাদের জীবন ব্যবস্থা তা নাগরিকের তথ্য চাওয়ার বিষয় থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়।

সারণি-৩.৬.১: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়

সময়	মন্ত্রণালয়ের নাম ও অবস্থান				
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
২০১৬	কৃষি মন্ত্রণালয় (৫৯৯টি)	অর্থ মন্ত্রণালয় (৫২৬টি)	এলজিআরডি এন্ড সি (২৭৮টি)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০৭টি)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (১২১টি)

২০১৭	কৃষি মন্ত্রণালয় (৭০১টি)	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (৫০৬টি)	এলজিআরডি এন্ড সি (২২৫টি)	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১১৪টি)	শিল্প মন্ত্রণালয় (১১০টি)
২০১৮	**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (১৬০০টি)**	কৃষি মন্ত্রণালয় (৮৯৫টি)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (৩১৮টি)	এলজিআরডি এন্ড সি (২৩৯টি)	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (১৯০টি)

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮। বন্ধনীতে আবেদনের সংখ্যা)

৩.৭ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ০৫টি জেলা

বিগত ২০১৬-১৮ মেয়াদে যেসব জেলায় সবচেয়ে বেশি তথ্য চেয়ে আবেদন পড়েছে তার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১১টি জেলা ঘুরে-ফিরে শীর্ষ ৫টি অবস্থানে রয়েছে। জেলাগুলো হলো দিনাজপুর, কুমিল্লা, নীলফামারী, সিলেট, গাজীপুর, যশোর, বরিশাল, ঢাকা, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুর। এর মধ্যে সবেচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে নীলফামারী এবং এরপর কুমিল্লা জেলায়। নীলফামারী প্রতিবছর ২য় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। দিনাজপুর ২০১৭ এবং ২০১৮ তে শীর্ষস্থানে রয়েছে। নিচের সারণি থেকে এটি স্পষ্ট যে, বর্ণিত জেলাগুলোর জনগণ অন্যান্য জেলার চেয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বেশি সচেতন রয়েছে বা ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী।

সারণি-৩.৭.১: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত জেলা

সময়	জেলার নাম ও অবস্থান				
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
২০১৬	কুমিল্লা (৮২৮টি)	নীলফামারী (৮০৮টি)	সিলেট (২৪৯টি)	গাজীপুর (২১৩টি)	যশোর (২০২টি)
২০১৭	দিনাজপুর (৪৪৩টি)	নীলফামারী (৩৭৩টি)	সুনামগঞ্জ (৩২৭টি)	বরিশাল (২৭৮টি)	রাজশাহী (১৮৪টি)
২০১৮	দিনাজপুর (৩৬০টি)	নীলফামারী (৩৪৬টি)	সিলেট (২৮৭টি)	ঢাকা (২৫৬টি)	রংপুর (২৪৪টি)

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮। বন্ধনীতে আবেদনের সংখ্যা)

৩.৮ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৭(১) উপ-ধারা অনুসারে তথ্য কমিশন নাগরিকগণ কর্তৃক তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের শুনানি শেষে দোষী সাব্যস্ত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের গুরুত্ব অনযায়ী প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে অনধিক ৫,০০০ টাকা জরিমানা করে থাকে। এ ছাড়া ২৭(৩) উপ-ধারা মোতাবেক উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করতে পারে। ২০১১-২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৫৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এরূপ শাস্তি প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ২০১১-১৫ মেয়াদে ০৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি দেয়া হয়। ২০১৬ সালে ০৬টি, ২০১৭ সালে ২৯টি এবং ২০১৮ সালে ১০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় (তথ্য কমিশন, ২০১৮)।

৪. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ

জনগণ তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করে। তাই এ আইনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ভিন্ন মাত্রার হবে। বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক পর্যায় থেকে আইনটি নিয়ে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করা হয়। রিইব, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, টিআইবি এর মতো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গবেষণার মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। এর পাশাপাশি অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, ড. ইফতেখারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, জনাব মরতুজা আহমদ, অধ্যাপক আফসান চৌধুরী প্রমূখের লেখায়, সাক্ষাৎকারে বা আলোচনায় চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গ উঠে আসে। এ ছাড়া তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনেও আইনটি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জের উল্লেখ থাকে। আলোচ্য নিবন্ধে উক্ত সকল চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে আইনটির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১ আইন সম্পর্কে অজ্ঞানতা

৪.১.১ আইন সম্পর্কে জনগণের যথাযথ জ্ঞানের অভাব

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এ আইন সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয়। যেহেতু আইনটি জনগণ প্রয়োগ করবে তাই তাদের জানা খুবই জরুরি। এ ছাড়া জনগণের রয়েছে তথ্য সাক্ষরতার ঘাটতি। অর্থাৎ কোন দপ্তরে গেলে কোন তথ্য পাওয়া যাবে বা কীভাবে তথ্য কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। তাই প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়ার আবেদনের সংখ্যা খুবই কম। টিআইবি এর একটি গবেষণায় অধ্যাপক আফসান চৌধুরী বলেন, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে

৭৫% ভাগ মানুষের কোনো ধারণা নেই। ২৫% ভাগ এ আইনটির কথা শুনলেও এর মধ্যে ২০% ভাগ মানুষ এ আইনটি কী তা জানেন না। মূলত মাত্র ৫% ভাগ মানুষের তথ্য অধিকার আইনের ধারণা রয়েছে (জাগোনিউজ২৪.কম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। কুমিল্লার একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির সদস্যদের উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, ৮৬% ভাগ উত্তরদাতা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না (রহমান: ২০১০)। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৩২% ভাগ জনগণ তথ্য আইন সম্পর্কে বোঝে না বললেই (very low) চলে। আর ৩২% ভাগ উত্তরদাতা কম (low) মাত্রায় বোঝে। মাত্র ৪% ভাগ উত্তরদাতা ভালোভাবে (high) বোঝে। অর্থাৎ ৬৪% ভাগই ঠিক মতো আইনটি বোঝে না (Hasan, 2014)। এমতাবস্থায় জনগণ আইনটি প্রয়োগ করে সুফল পেতে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪.১.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আইন সম্পর্কে অস্পষ্টতা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনেকের এ আইন সম্পর্কে সম্মক ধারণার ঘাটতি রয়েছে। অনেকে আবার হাতে-কলমে যথাযথ প্রশিক্ষণ পায়নি। এ আইনটি সঠিকভাবে রপ্ত করতে হলে কোয়ালিটি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অনেক প্রশিক্ষণে শুধুমাত্র ১/২ ঘন্টার সেশনে পুরো আইন রপ্ত করা সম্ভব নয়। এর অনেক খুঁটিনাঁটি বিষয় রয়েছে যা প্রয়োগের সময় জানা আবশ্যক। এ অস্পষ্টতার জন্য অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে অনীহা বা নেতিবাচক মানসিকতা কাজ করে। অনেক কর্তৃপক্ষ আবার কর্মকর্তাদের অনেকটা দায়সারাভাবে দায়িত্ব প্রদান করে রেখেছে। এহেন অবস্থায় অনেক দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, বিকল্প কর্মকর্তার নাম ও পদবি সহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেনি। আবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনেকের চাকুরি বদলিযোগ্য। এতে নতুনভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শিখতেও অনেক সময় লাগে। এমতাবস্থায় আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৪.২ গোপনীয়তার সংস্কৃতি ও মানসিকতা

এদেশের দপ্তরগুলোর বেশিরভাগই বেড়ে উঠেছে বৃটিশ-পাকিস্তান কলোনিয়াল ধাঁচে। যেখানে জনগণের কাছ থেকে দূরে থেকে সরকারি কর্মচারীগণ তথ্য গোপন করার সংস্কৃতির চর্চা করেছে। এটি দীর্ঘদিনের অনুশীলন হওয়ার ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তা রয়েই গেছে। এরা বৃটিশ আমলে প্রণীত কিছু দাপ্তরিক আইন-বিধির জালে নিজেদের আড়ালে রেখেছে। উদারহণস্বরূপ দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ১৯২৩ এর ৫(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর অধীন বা নিয়ন্ত্রণে কোন গোপন বিষয় (তথ্য) থাকা অবস্থায় (ক) স্বেচ্ছায় বিনিময় করে, (খ) তথ্য ব্যবহার করে, (গ) তথ্য বিক্রি করে, (ঘ) যৌক্তিক যত্ন নিতে ব্যর্থ হয় – তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারা মোতাবেক অপরাধী বলে গণ্য হবে। প্রায় ১৪৮ বছরের পুরনো এভিডেন্স এ্যাক্টের ১২৩, ১২৪ ও ১২৫ উপ-ধারা মতে কোন সরকারি অঙ্গসংগঠনের বিভাগীয়

প্রধানই শুধুমাত্র তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন। এ ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা ৯৯ অনুযায়ী তথ্য দেয়া যাবে না। রুলস অব বিজনেস (১৯৯৬) সংবাদকর্মীদের কাছে তথ্য প্রকাশে সরকারি কর্মকর্তাগণের উপর সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এর সাথে পরিপূরক হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের শপথনামাও রয়েছে (হালিম, ২০১০)। এ ছাড়া সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর (১৯) ধারায় দলিল-পত্রাদি সংবাদ মাধ্যম বা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এসব আইনে দীক্ষিত ও পরিচালিত। যদিও তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তথাপি দীর্ঘদিনের চর্চায় যে মানসিকতা গড়ে উঠেছে তা এখনো সুস্পষ্ট। ফলে জনগণের সাথে এ কর্তৃপক্ষ শ্রেণির বিস্তর ফারাক এখনো বিদ্যমান রয়েছে। জনগণের সাথে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাজ করে এরা নিজেদেরকে ঝামেলামুক্ত রাখার মানসিকতায় অভ্যস্ত। অথচ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যে বেতন-ভাতার সংস্থান হয় তা এ শ্রেণি ভুলে যায়। এর শেকড় উপড়ানো এত সহজ নয়। তাই যেকোনো অফিসে গেলে কর্মকর্তা-কর্মচারী এ গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করবেন তা অনেকক্ষেত্রে কঠিন হয়ে উঠছে।

৪.৩ কর্তৃপক্ষের অনীহা, অসচেতনতা ও অসহযোগিতা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা থাকা আবশ্যক। কিন্তু আইন পাশের প্রায় এক যুগ পরেও কর্তৃপক্ষের অনীহা, অসচেতনতা ও অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়ে জনগণকে খুঁজে নিতে হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে বা আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কে বা কোথায় আবেদন করতে হবে। অথচ এটি দপ্তরে সবার সহজে নজরে আসে এমন জায়গায় প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা বিধি-বিধানে রয়েছে। আবার অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাপ্তরিক বিধির মারপ্যাঁচ দেখিয়ে আবেদনকারীর আগ্রহের উপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অবাধ তথ্য প্রবাহ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং জনগণ আস্থা হারাচ্ছে। বিষয়টি তথ্য কমিশনের শুনানিকালে গোচরীভূত হচ্ছে। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ এর মতে, কমিশনের শুনানিতে উপস্থাপিত তথ্য ও দলিলপত্রে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীর তথ্যটি তাঁর কাছে মজুদ থাকা এবং তথ্যটি দেয়ার বাধ্যবাধকতা অনুধাবন করে সরবরাহ করতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের অনীহা বা অসহযোগিতার কারণে আইন প্রয়োগ করতে পারা যাচ্ছে না। এ জন্য আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের সংখ্যা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তা এখনো নিয়োগ হয়নি (আহমদ: ২০১৮)।

৪.৪ তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যা

তথ্য অধিকার আইনের ৫ ধারায় তথ্য সংরক্ষণ ও ৬ ধারায় তথ্য প্রকাশ ও প্রচার তথা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া ২২ আগস্ট ২০১০ তারিখে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ জারি করে (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০৩ নভেম্বর ২০১০)। বর্ণিত ধারা ও প্রবিধানমালায় তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বলা রয়েছে। কিন্তু এদেশের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি পুরনো এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। যথাযথ ক্যাটালগিং ও ইনডেক্সিং পদ্ধতির অনুসরণ সঠিক মাত্রায় করা হচ্ছে না। অনেক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস, সংরক্ষণ, বাছাই বা বিনষ্টকরণ, ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে ঠিকমতো বুঝতে পাচ্ছে না। বার্ষিক প্রতিবেদনও সঠিকভাবে প্রণীত হচ্ছে না। এতে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেমনটা প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ উল্লেখ করেন, তথ্য সহজলভ্যকরণ, সংরক্ষণ ও শ্রেণিবিন্যাস, ব্যবস্থাপনা; প্রকাশ ও প্রচার এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সুনির্দিষ্ট বিধান ও তা পালনে বাধ্যবাধকতা আইনে থাকা এবং উপর্যুপরি পত্র যোগাযোগ সত্ত্বেও তা অনুসরণ কর্তৃপক্ষ করছেন না (আহমদ: ২০১৮)। সরকার ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু করলেও তার গতি আশানুরূপ নয়। ইংল্যান্ডের মতো দেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর আরো কয়েক বছর লেগেছিল তথের সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে (ফেরদৌস, ২০১১)।

৪.৫ আইনের পরিধির ক্ষেত্রে ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সীমাবদ্ধতা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কর্তৃপক্ষের পরিধির ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যাচ্ছে। জনগণের অর্থ যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রহণ, ব্যয় করে আবার সরকারি স্বীকৃতি রয়েছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এ আইনের আওতায় আসেনি। যেমন- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান (রহমান, ২০১৭)। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অসংখ্য। এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে জনগণের মনে ব্যাপক ক্ষোভ ও জানার আগ্রহ রয়েছে। এদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সব ধরনের তথ্য জানা খুবই জরুরি। আবার যদি কোন কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয় তবে তার বিরুদ্ধে কমিশন আইনগতভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তবে এ সংক্রান্ত অভিযোগ এলে কমিশন দ্রুত নোটিশ করতে পারে। এটিও ভুক্তভোগী জনগণকেই করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৫. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও অসাধারণ আইন। এ আইনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে জনসাধারণের ক্ষমতায়নে এ আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো নিরসন করে আইনটি কার্যকর করা গেলে দেশের সরকারি-বেসরকারি নানা দপ্তর ও সংস্থার কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, দুর্নীতি হ্রাস এবং সর্বপরি সুশাসন নিশ্চিত করা অনেকাংশে সহজ হয়ে যাবে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়সমূহ নিম্নরূপ-

৫.১ জনসাধারণকে আইন ব্যবহারে সক্রিয়করণ

তৃণমূল পর্যায়ের সকল মানুষ যেন আইনটি ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সহজভাবে আইনটি তুলে ধরতে হবে। আইনটি সম্পর্কে ব্যাপকমাত্রায় তৃণমূল মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে যেন তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে তারা সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের মনে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর সম্পর্কে যেন নেতিবাচক কোনো ধারণা না থাকে বরং উৎসাহী হয়ে তথ্য গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হয় তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি।

৫.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপিল কর্মকর্তাদের কোয়ালিটি প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করতে হলে আইনটি সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষের গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। কিন্তু তা শুধুমাত্র অবহিতকরণ কর্মসূচির মতো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত হবে না। এ জন্য প্রয়োজন কোয়ালিটি প্রশিক্ষণ। শুধুমাত্র তথ্য অধিকারের উপর একক মডিউল প্রণয়ন করে তার উপর কোয়ালিটি প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দিলে আইন প্রয়োগে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতি বা ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে মুক্ত মনে তথ্য প্রদানে উদ্যোগী করে তুলবে।

৫.৩ আধুনিক ও ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

কর্তৃপক্ষের তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা হতে হবে আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে। যথার্থ ক্যাটালগিং ও ইনডেক্সিং পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা যায়। জনগণের অর্থে প্রণীত যাবতীয় প্রকাশনা এবং সংগৃহীত অন্যান্য তথ্যাদি ওয়েবসাইটে বা নেটওয়ার্কে প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সার্পোটের যোগান দেয়া প্রয়োজন।

৫.৪ আইনের পরিধি বাড়ানো

আইনে কর্তৃপক্ষের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ দেশের অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং বহুজাতিক সংস্থা রয়েছে যারা এ আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে বহু প্রশ্ন রয়েছে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা জরুরি।

৫.৫ সৃজনশীল প্রচার

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যেহেতু তৃণমূল মানুষের ধারণা একেবারেই নেই তাই এ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সৃজনশীল ও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তৈরি করে নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে প্রচার চালাতে হবে যে তৃণমূল মানুষের তথ্য সাক্ষরতা বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারে যে কোন তথ্য, কীভাবে, কোথায় পাওয়া যাবে এবং তা কীভাবে কাজে লাগাতে হবে।

৫.৬ কমিশনে শুনানির ক্ষেত্রে টিসিভি (time, cost, visit) হ্রাসের ব্যবস্থা

বিদ্যমান ব্যবস্থায় একজন অভিযোগকারীকে ঢাকায় এসে শুনানিতে অংশ নেয়ায় সময় লাগে ও খরচ হয় এবং আসা-যাওয়ায় ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এ ক্ষেত্রে কমিশনকে টিসিভি হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে শুনানির ব্যবস্থাকরণ বা উপজেলা নির্বাহী অফিস অথবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে (ইউডিসি) সম্পৃক্ত করে ভিডিও কনফারেন্সিং (কমিশন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শুরু করেছে মাত্র) এর মাধ্যমে ব্যাপকমাত্রায় শুনানির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.৭ কমিশনকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ

কমিশনকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য প্রয়োজনে আইনের সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ কমিশনের আদেশ/ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে 'Contempt Proceeding draw' করার ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। কমিশনের আদেশ না মানার ফলে ২০১৮ সালে ২৬টি এবং আদেশের আংশিক তথ্য প্রদানের ফলে ২০টি অভিযোগ দ্বিতীয়বারের মতো শুনানি করতে হয়েছে। এ ছাড়া কমিশনে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান সংবাদিক, গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগ, সাংবাদিকতা, তথ্য বিজ্ঞান বা আইন বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা যেতে পারে।

৫.৮ সম্পর্কিত ও সাংঘর্ষিক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন

যদিও অন্য আইনে যাই থাকুক না কেন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তথাপি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঐ সব আইন-বিধি বাধা সৃষ্টি করছে বা অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সাথে সম্পর্কিত ও সাংঘর্ষিক ঐ সব আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে তৃণমূলে বাস্তবায়ন মসৃণ করা যায়।

৫.৯ স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনা বা স্পিরিট সর্বোচ্চ প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। আর এটি করা যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে – জনগণকে আসতে হবে না বরং জনগণের কাছে কর্তৃপক্ষ যাবে। কিন্তু এটি আইনের বিধান থাকলেও তেমন কার্যকর হচ্ছে না। এটি কার্যকরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১০ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সাথে সমাজের সকল স্তরের অংশীজন জড়িত রয়েছে। তাই সকল অংশীজনের সমন্বয়ে স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ পরিকল্পনায় শিশু, নারী এবং প্রান্তিক মানুষের তথ্য অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হতে হবে।

৫.১১ গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিওদের বর্ধিত ভূমিকা

তথ্য কমিশনের একার পক্ষে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্ভব নয়। এ জন্য তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এনজিও, অ্যাকাডেমিশিয়ান ও আইনজ্ঞের বর্ধিত ভূমিকা রাখা খুবই জরুরি। এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে হবে। তৃণমূলে এ আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ করে এনজিও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৫.১২ তথ্য পাওয়ার সময় কমানো

বিদ্যমান আইনে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল তথ্য প্রদানের সর্বোচ্চ ২০ বা ক্ষেত্র মতে ৩০ কার্য দিবস নির্ধারণ করা রয়েছে যা বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি সময় বলে প্রতীয়মান। তাই এ সময় কমানো যেতে পারে।

৫.৮ সম্পর্কিত ও সাংঘর্ষিক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন

যদিও অন্য আইনে যাই থাকুক না কেন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তথাপি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঐ সব আইন-বিধি বাধা সৃষ্টি করছে বা অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সাথে সম্পর্কিত ও সাংঘর্ষিক ঐ সব আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে তৃণমূলে বাস্তবায়ন মসৃণ করা যায়।

৫.৯ স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনা বা স্পিরিট সর্বোচ্চ প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। আর এটি করা যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে – জনগণকে আসতে হবে না বরং জনগণের কাছে কর্তৃপক্ষ যাবে। কিন্তু এটি আইনের বিধান থাকলেও তেমন কার্যকর হচ্ছে না। এটি কার্যকরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১০ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সাথে সমাজের সকল স্তরের অংশীজন জড়িত রয়েছে। তাই সকল অংশীজনের সমন্বয়ে স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ পরিকল্পনায় শিশু, নারী এবং প্রান্তিক মানুষের তথ্য অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হতে হবে।

৫.১১ গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিওদের বর্ধিত ভূমিকা

তথ্য কমিশনের একার পক্ষে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্ভব নয়। এ জন্য তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এনজিও, অ্যাকাডেমিশিয়ান ও আইনজ্ঞের বর্ধিত ভূমিকা রাখা খুবই জরুরি। এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে হবে। তৃণমূলে এ আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ করে এনজিও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৫.১২ তথ্য পাওয়ার সময় কমানো

বিদ্যমান আইনে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল তথ্য প্রদানের সর্বোচ্চ ২০ বা ক্ষেত্র মতে ৩০ কার্য দিবস নির্ধারণ করা রয়েছে যা বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি সময় বলে প্রতীয়মান। তাই এ সময় কমানো যেতে পারে।

৬. উপসংহার

১৭৭৬ সালে সুইডেনে প্রণীত প্রথম তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের প্রায় ২৩৩ বছর পর এদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয় যার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে আইন কমিশনের সুপারিশের মধ্য দিয়ে। তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের উপর জনগণ কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। জনগণের ক্ষমতায়নে তাই আইনটি চমৎকার। এ আইনের মধ্য দিয়ে সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় সকল ধরনের তথ্য পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের ক্ষেত্রে। গণমাধ্যমগুলো সামনে সুযোগ এসেছে দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার। সুশাসন নিশ্চিতকরণে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার। তবে আইনটি প্রণয়নের প্রায় এক যুগের এসে এর কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে যেতে পারেনি। বিপুল জনগোষ্ঠীর তুলনায় তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। কমিশনে যে সব তথ্য না পেয়ে অভিযোগ করা হয়েছে তা অনেকটা সাধারণ তথ্য। বিপুল জনগোষ্ঠী আইনটি সম্পর্কে অবগত নয়। এনজিও থেকে তথ্যের আবেদনও অনেক কম। কয়েকটি জেলায় কোন কোন বছর তথ্য চেয়ে কোন আবেদনই পড়েনি। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকেই সবচেয়ে বেশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জমা পড়েছে বিগত কয়েক বছরে। এই তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি যার পেছনে কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসবের মধ্যে আইন সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আপিল কর্তৃপক্ষের আইনটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণার অভাব, নেতিবাচক মানসিকতা ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি ধারণ, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি ইত্যাদি অন্যতম। এ সব চ্যালেঞ্জ নিরসনে যে সব করণীয় আলোচ্য নিবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা মানা হলে তথ্য অধিকার আইন এর মৌল উদ্দীপনা বা স্পিরিট বাস্তবায়িত হবে। তবে এর সাথে যে বিষয়টি খুবই জরুরি তা হলো নীতি-নির্ধারকদের সদিচ্ছা। এসবের ব্যবস্থা করা হলে আইনটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ হবে এবং জনগণ কাঙ্খিত সুফল পাবে।

তথ্য-নির্দেশ

আহমদ, মরতুজা (২০১৮)। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর একটি বিশ্লেষণ'। অন্তর্গত, কালের কণ্ঠ। ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

আহমদ, মরতুজা (২০১৯)। 'তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন'। অন্তর্গত, তথ্য কমিশন নিউজ লেটার, জুন সংখ্যা। ঢাকা: তথ্য কমিশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। লিঙ্ক- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.

html, ০১ জুন ২০২০ এ প্রবেশ।

জাগোনিউজ২৪.কম, ঢাকা: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, লিঙ্ক: https://www.jagonews24.com/education/news/529313, ৩১ মে ২০২০ এ প্রবেশ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। লিঙ্ক- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1011.html, ০৫ জুন ২০২০ এ প্রবেশ।

তথ্য কমিশন, (২০০৯)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯। ঢাকা।

(২০১০)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০। ঢাকা।

(২০১৬)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬। ঢাকা।

(২০১৭)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭। ঢাকা।

(২০১৮)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮। ঢাকা।

দাশ, ভবেশ এবং রোবায়েত ফেরদৌস (২০০৭), সম্পাদিত। তথ্যের অধিকার। ঢাকা: চারদিক।

ফেরদৌস, রোবায়েত (২০১১)। 'তথ্য অধিকার আইন: বাস্তবায়ন চালচিত্র ও চ্যালেঞ্জ-দুই'। অন্তর্গত, বাংলানিউজ২৪.কম। ঢাকা, ০৬ অক্টোবর ২০১১।

ফেরদৌস, রোবায়েত এবং অলিউর রহমান (২০০৮)। তথ্য অধিকারের স্বরূপ সন্ধানে। ঢাকা: ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)।

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০৩ নভেম্বর ২০১০।

রহমান, অধ্যাপক ড. গোলাম (২০১৭)। 'তথ্য অধিকার আইনের পরিধি বাড়াতে হবে'। অন্তর্গতা, দৈনিক সমকাল। ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

রহমান, কাজী সোনিয়া (২০১০)। "গ্রামীণ মানুষের তথ্য চাহিদা: রাইচোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপর একটি সমীক্ষা", অন্তর্গত, পল্লী উন্নয়ন জার্নাল। কুমিল্লা: বার্ড, সংখ্যা ১৩।

রফিকুজ্জামান, মো. (২০১৬)। 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, তথ্য অধিকার আইন:

প্রাসঙ্গিক ভাবনা'। অন্তর্গত, ভোরের কাগজ। ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব), (২০১১)। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর: একটি পর্যালোচনা। ঢাকা: রিইব।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০১৭)। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ। ঢাকা: বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

হক, মুহাম্মদ লুৎফুল (২০১৩)। 'তথ্য অধিকার দিবস: আমাদের কী করতে হবে'। অন্তর্গত, প্রথম আলো। ঢাকা: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

হালিম, ড. সাদেকা (২০১০)। 'তথ্য অধিকার আইন: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ'। অন্তর্গত, একুশ নিউজ মিডিয়া। লস এঞ্জেলেস, লিঙ্ক: https://ekush.wordpress.com/, ০৩ জুন ২০২০ তে প্রবেশ।

Hasan, Ziaul (2014). 'Compliance of the provisions of RTI Act, 2009 by NGOs in Bangladesh: A Case-Study of BRAC', an Unpublished MA Thesis, submitted to Institute of Governance Studies, BRAC University, Dhaka.

www.ngoab.gov.bd, ০১ জুন ২০২০ এ প্রবেশ।